ইউনিট ৪
কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন

ইউনিট ৪ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। আজ জাতীয় জীবনে প্রাণ প্রাচুর্যের প্রয়োজন। প্রয়োজন জনসাধারণের আর্থ সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের। আমাদের বর্তমান অবস্থা যেন টিকে থাকারই নামান্তর, বেঁচে থাকার জন্য নয়। অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে জনগণের জীবনে অর্থবহ করতে হলে সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রয়োজন। বঞ্চিত এ পরিবর্তন বা সংস্কার কেবলমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণগঠনের মাধ্যমে আসতে পারে। তাই স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই সোচ্চার দাবী উঠেছে সেকেলে ও অনুন্নত শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে আত্মমর্যাদাশীল জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম একটি বিজ্ঞান সম্মত, উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য। আধুনিক শিক্ষানীতির সাথে সংগতি রক্ষা করে প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সকল পর্যায়ে এ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন গতির সঞ্চার করতে হবে। সর্বস্তরের জনগণের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

এ ইউনিট পাঠে কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টের বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৪.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কুদরত-ই-খুদা রিপোর্টের পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এ রিপোর্টের অন্তর্ভূক্ত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ক. কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টের পটভূমি

স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় একটি যুগান্তকারী ঘটনা। রক্তঝরা দিনগুলো সীমাহীন ত্যাগ ও কঠোর সংগ্রামের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে জনজীবনে অর্থবহ করতে হলে ইংরেজ প্রবর্তিত ও পাকিস্তান আমলে প্রচলিত শিক্ষা যে যুগের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম নহে তা বলাই বাহুল্য। তাই সর্বমহল থেকে শিক্ষা সংস্কারের দাবী উঠেছে। বাংলাদেশের জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে হলে জনগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। যাতে জনগণ দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সত্যিকার জনসম্পদে পরিণত হতে পারে। এ দেশের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলে অনেক প্রতিবন্ধকতা এসেছিল। এসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এ দেশের জনগণ ও ছাত্র সমাজ। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ঐ শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণগঠন জাতির নিকট মৌলিক দায়িত্ব।

২৬ শে জুলাই, ১৯৭২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির নানাবিধ অভাব ও ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশনা এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার এ কমিশন নিয়োগ করেন। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন। প্রধান মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর উদ্দীপনাময় উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণবিন্যাসের লক্ষ্যে সুচিন্তিত পরামর্শদানের জন্য কমিশনের সদস্যদের আহবান জানান। দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে এ কমিশন গঠিত হয়। স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা

এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। সভাপতির নাম অনুসারে এই কমিশন কুদরত-ই-খুদা নামে পরিচিত। বিভিন্ন পেশার লোকদের নিকট থেকে কমশিন প্রশ্নমালার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কিত মূল্যবান অভিমত সংগ্রহ করেন। কমিশন অভিমতগুলোর ব্যাপক পর্যালোচনার পর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণবিন্যাসের লক্ষ্যে সুচিন্তিত সুপারিশ প্রণয়ন করেন এবং ৩০ শে মে, ১৯৭৪ তা রিপোর্ট আকারে সরকারের নিকট পেশ করেন।

খ. কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টে বর্ণিত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষা পূর্ণগঠনের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক সুপারিশ আকারে পেশকৃত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবলী নিম্নরূপ–

১। শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা আকাংখা রূপায়নের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্ধারণের হাতিয়ার। সুনাগরিক সৃষ্টিতে এবং প্রগতিশীল সমাজ গঠনে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক যেন জাতীয় আদর্শ আশা-আকাংখা ও ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং মাতৃভূমি ও জনগণের কল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিক সুনাগরিকরূপে গড়ে ওঠে। শুধু জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, কৌশল অর্জন নয় শিক্ষার্থীর মনে মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধও সৃষ্টি করতে হবে। কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে যেন সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করে চরিত্রবান, নিলোর্ভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে।

২। দীর্ঘ দিনের শোষণ জর্জরিত সমাজের দ্রুত সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষাকে বিশেষ হাতিয়র রূপে প্রয়োগ করতে হবে। মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী সমাজ জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ যাতে অগ্রসর হতে পারে; শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার বাহক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার বৃত্তিমূলক দক্ষতা সৃষ্টির ও বন্দোবস্ত করতে হবে। নানাবিধ কুসংস্কার, অনাচার ও দুর্নীতির অবসানের অনুকূল বিজ্ঞানমূখী আদর্শবাদী ও সামাজিক উন্নয়নের পরিপোষক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য প্রতিটি নাগরিকের একটি ন্যুনতম মান পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৩। আমাদের দেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম। আমাদের জীবান যাত্রার মান পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় নিম্নস্তরে রয়েছে। জাতি হিসেবে আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন এই জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালানো। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি সামাজিক পুঁজি বিশেষ বলে জনসাধারণের শিক্ষা লাভের সাথে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসও সূচিত হয়। আমাদের বিপুল জনশক্তি কর্মে নিয়োজিত এবং আধুনিক সমাজের উপযোগী বিভিন্নমূখী দক্ষতা অর্জন করলে অনিবার্য ভাবে জাতীয় সম্পদ সমৃদ্ধ হবে। জনশক্তিকে কর্মে নিয়োগের সেই শিক্ষা এবং উপযুক্ত দক্ষতা দানের সেই ব্যবস্থা থাকতে হবে সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনায়।

৪। জাতি হিসেবে আমাদের দুর্বলতা হচ্ছে হাতের কাজের প্রতি অনীহা এবং কায়িক শ্রমের মর্যাদাদানে কুণ্ঠাবোধ। এ মানসিকতা বিদ্যামান থাকলে গঠনমূলক উন্নয়ন কর্ম মন্থরগতি হতে বাধ্য। এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় হাতের কাজের ওপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, কৌশলী জন সম্পদ সৃষ্টির জন্য যেমন একদিকে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগ মুখিতার মাধ্যমে মানসিক শ্রমের সংগে উৎপাদনমুখী কায়িকশ্রমের সমন্বয় সাধন করতে হবে তেমনি অন্যদিকে কৃষি, বিজ্ঞান; কলা, শিল্প, প্রযুক্তি, চিকিৎসা বাণিজ্য, শিক্ষক শিক্ষণ প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষাধারা প্রবর্তন করতে হবে। যে সব বয়স্ক কর্মজীবী ইতিপূর্বে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি, তাঁদেরও শিক্ষার মাধ্যমে শ্রম দক্ষতা ও মানসিক গুণাবলীর উন্নয়নের সুযোগ দিতে হবে।

৫। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু তথ্য আহরণ নয়, উপলব্ধি বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান প্রভৃতি গুণাবলী বিকাশে র ব্যবস্থা থাকবে।

এ জন্য তারুণ্যের সৃজনশীলতা ও কর্মশক্তির যথাযথ মর্যাদাদান এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির গণতান্ত্রিক রূপায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সর্বতোভাবে শিক্ষা নীতিকে গতিশীল করতে হবে। সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তেমনি সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির সংগে শিক্ষা ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। নিম্নবর্ণিত কোন্ তারিখে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়?
- (ক) ২৩ শে জুলাই, ১৯৭২
- (খ) ২৬ শে জুলাই ১৯৭২
- (গ) ২৭ শে জুলাই ১৯৭২
- (ঘ) ২৮ শে জুলাই ১৯৭২

২। নিম্নের কোন তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ শিক্ষা কমিশন উদ্বোধন করেন?
- (ক) ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭২
- (খ) ২৫ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭২
- (গ) ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭২
- (ঘ) ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

৩। কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট কত সালে সরকারের নিকট পেশ করা হয়?
- (ক) ১৯৭২ সালে
- (খ) ১৯৭৩ সালে
- (গ) ১৯৭৪ সালে
- (ঘ) ১৯৭৫ সালে

৪। কী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কুদরত-ই-খুদা কমিশন গঠিত হয়?
- (ক) প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য
- (খ) মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য
- (গ) উচ্চ শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য
- (ঘ) সর্বস্তরের শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য

৫। উন্নয়নের পরিপোষক মনোভঙ্গী কীভাবে গড়ে তুলতে হবে?
- (ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে
- (খ) একটি নূণ্যতম মান পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের নিশ্চিত করে
- (গ) মাধ্যমিক স্তরকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্তরে রূপান্তরিত করে
- (ঘ) উন্নয়নের জন্য ব্যাপক প্রচার অভিযান চালিয়ে

৬। জাতীয় চরিত্রের প্রধান দুর্বল দিক কোনটি?
- (ক) অলসতা
- (খ) দুর্নীতি পরায়নতা
- (গ) হাতের কাজের প্রতি অনীহা
- (ঘ) বিলাসিতা

পাঠ ৪.২ প্রাথমিক শিক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আট বছর মেয়াদী বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে পারবেন।
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের ব্যাপক পূর্ণবিন্যাস করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও মহিলা শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে অবহিত করতে পারবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়েই জনশিক্ষা বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়। বাংলাদেশের শতকরা ৭৭ জন লোক নিরক্ষর। নিরক্ষরতা জাতির অগ্রগতির জন্য বিশেষ অন্তরায়। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিকদের অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। এ উপলব্ধির প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে কুদরত-ই-খুদা কমিশন কিছু মূল্যবান সুপারিশ পেশ করেন।

ক. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সমস্যা

প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে–

১। শিশুর নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন।

২। শিশুর মনে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ ও কৌতুহলবোধ জাগ্রতকরণ এবং অধ্যবসায়, শ্রম, সদাচার ও ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলীর সম্যক বিকাশ সাধন।

৩। মাতৃভাষার লিখন, পঠন ও হিসাব রক্ষনের ক্ষমতা অর্জন, তদুপরী ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে যে সব মৌলিক জ্ঞান ও কলা কৌশলের প্রয়োজন হবে সে সবের সংগে কিছুটা পরিচিতি করণ।

৪। পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। অতীতে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত অবহেলিত হয়েছে ফলে এই স্তরে শোচনীয় অবস্থা বিরাজ করেছে এবং শিক্ষার ব্যাপক অপচয় ঘটেছে। আমাদের প্রাথমিক স্কুলগুলি বর্তমানে যে সব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন সেগুলো হচ্ছে–

   ক. জীবন কেন্দ্রী বাস্তবমুখী শিক্ষাসূচীর অভাব।

   খ. উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং উদ্যোগী শিক্ষকের অপ্রতুলতা।

   গ. প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষের অভাব।

   ঘ. সুলিখিত এবং চিত্তাকর্ষক পাঠ্য পুস্তকের অভাব।

   ঙ. প্রয়োজনীয় আসবাপত্র, শিক্ষার উপকরণ, খেলার সরঞ্জাম ও লাইব্রেরীতে পুস্তকের অভাব।

খ. আট বছর মেয়াদী অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন

দেশের জনগণকে জাতীয় কর্মে ও উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকায় অংশ গ্রহণের জন্য শিক্ষিত করে তুলতে হলে একটি সার্বজনীন শিক্ষা পদ্ধতির আবশ্যক। এই বাধ্যতামুলক শিক্ষা এমন পর্যায়ের হওয়া দরকার যাতে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে স্বাধীন নাগরিকের সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার ও তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। পৃথিবীর উন্নত দেশ সমূহে আট হতে বার বছরের বাধ্যতামুলক শিক্ষার মেয়াদ চালু রয়েছে। আমাদের বর্তমান পাঁচ বছর মেয়াদী শিক্ষা দায়িত্বশীল নাগরিক ও উন্নত ব্যক্তি গঠনের জন্য যথোপযুক্ত নয়। কারণ পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তত্ত্ব সম্পর্কে শিশু মনে ধারণা ও বোধশক্তি জাগ্রতকরার এবং অর্থকরী বিদ্যার প্রাথমিক বছরের শিক্ষা অত্যাবশ্যক। দুনিয়ায় জ্ঞান বিজ্ঞানের যে

প্রসার হচ্ছে, তাতে শিক্ষায়তনে কমপক্ষে আট বছর মেয়াদের একটি জীবন্ত ও বাস্তব পরিবেশ ভিত্তিক সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রম চালু করতে না পারলে সে শিক্ষাকে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার রূপে কাজে লাগানো যাবে না। এ কারণে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে পরিগণিত করে তাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করতে হবে।

তাই কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেন যে, প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু রয়েছে তা ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রবর্তন করতে হবে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কারণে পাঁচ থেকে তের বছর বয়স্ক অধিকাংশ বালক বালিকাকেই পরিবারের আর্থিক উপার্জনের জন্য কিছু দায়িত্বগ্রহণ করতে হয়ে। তার ফলে তাদের অনেকের পক্ষে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয় না। কিংবা সম্ভব হলেও তারা বেশি দিন শিক্ষারত থাকতে পারে না। এদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে তাদের জন্য প্রয়োজনবোধে নৈশ স্কুলে শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। এসব নৈশ স্কুলে পনর বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

গ. প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষাক্রম পূর্ণবিন্যাস ও মহিলা শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা

দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিবেশ, সমাজের চাহিদা, ছাত্রদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অভিরুচির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাক্রমের ব্যাপক পূর্ণবিন্যাস করা দরকার। প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষা পদ্ধতি কর্মমুখী হবে এবং পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের চাইতে হাতে কলমে শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সমগ্র দেশ সরকারী ব্যায় প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত একই মৌলিক কাঠামোর মধ্যে সমাজ জীবনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নতার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমানের সব মৌলিক পার্থক্য দূরীভূত করে অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পঠিতব্য বিষয় হচ্ছে– (১) বাংলা, (২) অংক, (৩) ইতিহাস, (৪) ভূগোল, (৫) বিজ্ঞান, (৬) দ্বিতীয় ভাষা, (৭) শরীরচর্চা ও খেলাধুলা, (৮) কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীত, (৯) চিত্রাংকন (১০) ধর্ম শিক্ষা অথবা নীতি বিষয়ক শিক্ষা, (১১) হাতের কাজ, (১২) কৃষি সম্প্রসারণ কাজ। প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত পাঠ্যসূচি কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটির দ্বারা প্রণয়ন করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন সর্বাধিক। এ জন্য শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যাপক সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্যের জন্য দেশে একটি প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ও একটি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড স্থাপন করা দরকার। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালিকাদের সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মাত্র। এই হার অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক। মেয়েদের আরও অধিক সংখ্যক স্কুলের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। সহ শিক্ষার বিদ্যালয়গুলিতে মহিলা নিয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। তদুপরি প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকতার জন্য বিশেষ করে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য মহিলা শিক্ষক নিয়োগই বাঞ্চনীয়। তাঁরা যাতে অধিক সংখ্যায় এই কাজের ব্রতী হন সে বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্ট কত বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা দরকার?

(ক) পাঁচ বছর মেয়াদী
(খ) সাত বছর মেয়াদী
(গ) আট বছর মেয়াদী
(ঘ) দশ বছর মেয়াদী

২। পৃথিবীর উন্নত দেশ সমূহে সাধারণতঃ বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ কত বছর?

(ক) আট হতে চৌদ্দ বছর
(খ) আট হতে বার বছর
(গ) আট হতে তের বছর
(ঘ) আট হতে দশ বছর

৩। পাঁচ থেকে তের বছরের অধিকাংশ বালক বালিকা কেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না?

(ক) অভিভাবকদের দারিদ্রতার কারণে
(খ) যথেষ্ট সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায়
(গ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও শিক্ষা সরঞ্জাম না থাকায়
(ঘ) ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষক সংখ্যা কম হওয়ায়

৪। প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পকে সাফল্যমন্ডিত করতে হলে কাদের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে?

(ক) ছাত্রদের উপর
(খ) অভিভাবকদের উপর
(গ) উপযুক্ত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের উপর
(ঘ) সমাজকর্মীদের উপর

৫। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালকদের অনুপাতে বালিকাদের মোট সংখ্যা কত?

(ক) অর্ধাংশ
(খ) এক তৃতীয়াংশ
(গ) এক চতুর্থাংশ
(ঘ) এক পঞ্চমাংস

৬। অধিকা হারে বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আকৃষ্ট করার জন্য কুদরত-ই-খুদা কমিশন কী সুপারিশ করেন?

(ক) উন্নত শিক্ষা সরঞ্জামের ব্যবস্থাকরণ
(খ) কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীতের বিষয় প্রবর্তন
(গ) শরীর চর্চ্চা ও খেলাধুলার আয়োজন
(ঘ) মহিলা শিক্ষক নিয়োগ

পাঠ ৪.৩ মাধ্যমিক শিক্ষা

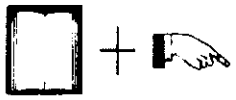

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মাধ্যমিক স্তরের সংগঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষায় রূপান্তর করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষা কাঠামো জানতে পারবেন।

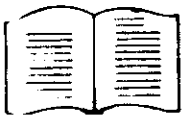

বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল পুঁথিকেন্দ্রিক বাস্তব কর্মমুখীতা বিবর্জিত। এ শিক্ষা উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে বিবেচিত হতো। ইংরেজ রাজত্ব অবসানের পর থেকেই সরকার এবং জনসাধারণ উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে, প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রয়োজন মেটানোর জন্য দক্ষতা ও নৈপুণ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম নহে। এ স্তরের শিক্ষাকে কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগদানের প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে গ্রহন না করে স্বয়ং সম্পূর্ণ স্তরে পরিণত করা উচিৎ। বাংলাদশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালে কমিশন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে।

ক. মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার নিম্নরূপ উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে–

১। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা।

২। সমন্বিত ও কল্যাণ ধর্মী জীবন যাপনের জন্য সচেতন কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ সৎ ও প্রগতিশীল জীবন দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির বিকাশ সাধন করা।

৩। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়াসে প্রয়োজনীয় কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মকুশল জনশক্তি সরবরাহ করা এবং

৪। মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষা উপযোগী করে গড়ে তোলা।

খ. মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের সংগঠন

মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর। শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা কৈশোর ও কৈশোরত্তর কালের শিক্ষা। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর ধরা হলে নবম শ্রেণী থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে মাধ্যমিক পর্যায় বলে গণ্য করা যায়। নবম থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রমের যোগসূত্র বজায় রাখা ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় সমতা নিশ্চিত করার জন্য একই শিক্ষায়তনে এই তিন/চারটি শ্রেণীর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এ স্তরের সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে যোগসূত্র ও সমন্বয় প্রয়োজন। এ স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়সের প্রেক্ষিতে একই শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্মত। বর্তমানে ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষাকে একটি ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থা বলে মনে করে, ফলে ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর সাথে তাদের মানসিক যোগসূত্র গভীরতা লাভ করে না। এ অবস্থায় অবসানকল্পে বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর কর্তৃপক্ষকে ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন না করে নবম ও দশম শ্রেণী খোলার নির্দেশ দিতে হবে। এতে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াও মাধ্যমিক স্তরে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর চাপ নিরসনে নতুন মাধ্যমিক স্কুল খোলার ব্যয় ভার অনেকাংশে লাঘব হবে।

গ. মাধ্যমিক শিক্ষাকে অধিকাংশের জন্য প্রান্তিক শিক্ষায় রূপান্তর

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, জীবন যাত্রা, স্থানীয় অর্থনীতির কর্মধারা ও কর্মজীবনে প্রবেশের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সুষ্ঠু প্রতিফলন মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে থাকা বাঞ্চনীয়। কারণ নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে (যাদের বয়স সীমা ১৪ থেকে ১৭ বছর) প্রতি বছর গড়ে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ্যের মত ছাত্র-ছাত্রী নানা কারণে স্কুলের পড়াশুনা ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে সমাজ জীবনে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। অথচ জীবিকা অর্জনের সহায়ক তেমন কোনো প্রশিক্ষণ তারা পায় না। ফলে তাদের অধিকাংশই ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করে এবং বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে সমাজের জীবনধারায় আপন সংকীর্ণ ভূমিকা পালন করে যায়। যে কোনো দেশের পক্ষে এ অবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিক্ষা ও স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে বিবেচিত হবে। (প্রান্তিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা মোটামুটি একাদশ শ্রেণী এবং সাধারণ শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। এ উদ্দেশ্যে নবম শ্রেণী হতে শিক্ষা কার্যক্রম মূলত দ্বিধা বিভক্ত হবে। (ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও (খ) সাধারণ শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের উল্লেখিত সাধারণ উদ্দেশ্যাবলীর প্রথম দুটি উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নবম ও দশম শ্রেণীতে উভয় ধারায় কয়েকটি বিষয় আবশ্যিক গঠনীয় হিসেবে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত থাকবে। আবশ্যিক বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থীরা স্বনির্বাচিত ধারায় বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করবে। দশম শ্রেণীর পর সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষার্থীরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষা সমাপনান্তে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে পারবে। দ্বাদশ শ্রেণীর পর সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষার্থীরা বহি পরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে। অপর পক্ষে বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করবে। একাদশ শ্রেণীতে প্রশিক্ষণের পর বৃত্তিমূলক দশম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্তির পর যারা শিল্প কারখানায় দক্ষ শ্রমিক হিসাবে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য শিল্পে শিক্ষানবীশ কার্যক্রমের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রান্তিক শিক্ষা প্রাপ্ত এসব শিক্ষার্থী কর্মকুশল, দক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ জনশক্তি হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করে ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে সচেষ্ট হতে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর সাধারণ শিক্ষা লাভের পথও উন্মুক্ত থাকবে।

ঘ. মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা অন্তর্ভূক্তির প্রয়োজনীয়তা

মাধ্যমিক স্তরের এই শিক্ষা মূখ্যতঃ প্রান্তিক শিক্ষা, সেজন্য নবম শ্রেণীতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভের পরও একাদশ শ্রেণীতে বিশেষ প্রশিক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছে। এই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেশের উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের চাহিদা এবং কর্মপ্রদাহ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনানুযায়ী নির্ণীত হবে। আগেই বলা হয়েছে যে অধিকাংশ শিক্ষার্থী প্রান্তিক শিক্ষা লাভের পর জনশক্তিতে পরিণত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। প্রস্তাবিত এসব বৃত্তিমূলক কোর্স আরও একভাবে সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে। মাধ্যমিক স্তরে প্রান্তিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সবার জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করা দুরূহ কাজ।

আশা করা হচ্ছে যে এদের অনেকেই নিজের উদ্যোগে স্বর্নিভর হয়ে কর্ম সংস্থান করে নেবে। এজন্য অবশ্য মূলধনের প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি সীমিত সম্পদের অধিকারী সেজন্য পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মীদের সহজ শর্তে মূলধন প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। কর্মকুশলতাকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রয়োজন মতো সমবায় সংস্থা গঠন হবে। সরকারী প্রচেষ্টায় এ দুটো ক্ষেত্রে সাহায্য পেলে অনেকেই চাকুরি না খুজে আপন বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রয়োগের প্রয়াস পারে এবং নিজের কর্মসংস্থান নিজেই সৃষ্টি করে নেবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও তাকে জনপ্রিয় করার জন্য ভারতের কয়েকস্থানে "শেখো ও উপার্জন করো" প্রকল্পের মত আমাদের দেশেও অনুরূপ একটি প্রকল্প চালু করা উচিত হবে। প্রকল্পটির প্রচারের জন্য ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সরকার ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যৌথ আর্থিক সহায়তায় বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে

হবে। এবং কাঁচামাল ক্রয় ও আনুসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে একটি আবর্তক তহবিল সৃষ্টি করতে হবে। নবম হতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজের কার্ড রাখা হবে যাতে কাজের পরিমাণ ও মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টন করা সম্ভব হয়। তৈরি পণ্যের বাজারজাত করার জন্য একজন মার্কেটিং অফিসারের অধীনে কেন্দ্র খুলতে হবে। তদুপরি এসব পণ্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সরকার সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে নির্দেশ দেবেন।

৬. সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষার কাঠামো

উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতিদানের উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের এই শিক্ষা প্রবর্তিত। এই শিক্ষাক্রম চার বছর মেয়াদী অর্থাৎ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত থাকবে। সব শিক্ষার্থীই এ পর্যায়ে নবম ও দশম শ্রেণীতে পাঁচ বা ছয়টি নির্দিষ্ট বিষয় আবশ্যিক পঠনীয় হিসেবে অধ্যয়ন করবে। এছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থী পছন্দসই বিভাগ অনুযায়ী আরও দুই বা তিনটি বিষয় ও একটি বৃত্তিমূলক বিষয় নির্বাচন করবে। বৃত্তিমূলক বিষয় অধ্যয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে ছাত্রছাত্রীদের মনে কায়িক শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ অক্ষুন্ন থাকে। দশম শ্রেণীর শেষে শিক্ষার্থীরা বহিঃ পরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে। শিক্ষার্থীদের শরীর চর্চা ও খেলাধুলার নিয়মিত এবং সমাজকল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মে বছরে ৬০ ঘন্টা বাধ্যতামূলকভাবে যোগ দিতে হবে।

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষার কাঠামো অনুসারে প্রাথমিক স্তর পাঁচ বছর, মাধ্যমিক স্তর পাঁচ বছর, ইন্টারমিডিয়েট স্তর দুই বছর, বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ডিগ্রী মেয়াদ দুই বা তিন বছর এবং দ্বিতীয় ডিগ্রীর মেয়াদ দুই বা এক বছর। অবশ্য পেশাগত ডিগ্রীর ব্যাপারটি উপরোক্ত সাধারণ ডিগ্রী হতে স্বতন্ত্র। ইন্টারমিডিয়েট বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটি একটি বিশেষ স্তর হিসেবে গণ্য হতে পারে না, কেননা একদিকে মাধ্যমিক স্তর অন্য দিকে ডিগ্রী স্তর এবং এ দু'টির মধ্যস্থিত উপরোক্ত কোর্সটি কোন স্তরের সংগে সত্যিকার ভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। ইন্টারমিডিয়েট স্তরের বিলোপ সাধন করে এর একটি বছর মাধ্যমিক স্তরের সংগে এবং অন্য বছরটি ডিগ্রী স্তরের সংগে সংযোজিত করলে অধিক বিষয়ে বাঞ্ছিত ব্যুৎপত্তিলাভ সম্ভবপর হবে। কেননা প্রথম ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ তিন বছরের চেয়ে কম হওয়া সমীচিন নয়, অন্য পক্ষে নবম শ্রেণীর সংগে একটি অতিরিক্ত বছর যোগ করলে সমন্বিত বহুমুখী শিক্ষাক্রম চালু করার পক্ষে সহায়ক হবে। অবশ্য আমাদের বর্তমান অবস্থায় তা বাস্তবায়নের পক্ষে অসুবিধা অতিক্রম করতে হবে, যেমন উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে এম,এ. ও এম,এস.সি পাস শিক্ষক নিয়োগ, পাঠাগার গবেষণাগার ইত্যাদি সম্যক উন্নয়ন, নতুন শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ, স্কুল কলেজের আর্থিক অসংগতি দূরীকরণ ইত্যাদি। সব কিছু বিবেচনা করে শিক্ষার কাঠামোগত পরিবর্তনের ব্যাপারে এ কমিশন কর্তৃক যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে–

ক. একাদশম শ্রেণী সমন্বিত মাধ্যমিক স্কুল সম্পর্কে প্রথম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা কালে দেশের কিছু সংখ্যক শিক্ষায়তনে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলুক। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক প্রমাণিত হলে দ্বিতীয় জাতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার ক্রম রূপায়নের কার্যক্রম স্থির করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ হবে তিন বছর এবং মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ হবে দুই বছর।

খ. আগামী পাঁচ বছরে শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষার মান বিশেষ ভাবে উন্নীত হলে দশ বছর স্কুল শিক্ষার পর প্রথম ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির বিষয়ও বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে তিন বছর ডিগ্রী কোর্স এবং চার বছরের অনার্স ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন করতে হবে। আর মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স হবে পাস ডিগ্রীধারীদের বেলায় দুই বছর এবং অনার্স ডিগ্রীধারীদের বেলায় এক বছর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। শিক্ষার্থীর বয়ঃসীমা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে–
- (ক) বাল্যকালের শিক্ষা
- (খ) কৈশোরকালের শিক্ষা
- (গ) কৈশোর ও কৈশোরত্তর শিক্ষা
- (ঘ) যৌবনকালের শিক্ষা

২। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের অভিমত অনুযায়ী ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর কর্তৃপক্ষকে কী নির্দেশ দিতে হবে?
- (ক) নবম ও দশম শ্রেণী খোলার
- (খ) ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করার
- (গ) ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোকে সুসংহত করার
- (ঘ) ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশ উঠিয়ে দিয়ে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত করার

৩। মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীরা বহি পরীক্ষা গ্রহণ করবে ও সার্টিফিকেট পাবে–
- (ক) নবম শ্রেণীতে প্রশিক্ষণের পর
- (খ) দশম শ্রেণীতে প্রশিক্ষণের পর
- (গ) একাদশ শ্রেণীতে প্রশিক্ষণের পর
- (ঘ) দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রশিক্ষণের পর

৪। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে কীরূপে প্রান্তিক শিক্ষার রূপ দিতে হবে?
- (ক) বিদ্যালয়ে সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে
- (খ) যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করে
- (গ) নতুন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে
- (ঘ) যারা ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম তাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়ে

৫। 'শেখো ও উপার্জন করো' প্রকল্পে কোন প্রতিবেশী দেশে চালু করা হয়েছে?
- (ক) বার্মায়
- (খ) সিংহলে
- (গ) পাকিস্তানে
- (ঘ) ভারতে

৬। বর্তমানে নবম ও দশম শ্রেণীর সংগে একাদশ শ্রেণী সংযোজনের প্রধান অন্তরায় কী?
- (ক) শিক্ষা সরঞ্জামের অভাব
- (খ) বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষের অভাব
- (গ) শিক্ষার্থীর অভাব
- (ঘ) এম.এ. ও এম.এস.সি পাস শিক্ষকের অপ্রতুলতা

পাঠ ৪.৪ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- শিক্ষক শিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাইমারী শিক্ষক শিক্ষণ ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করতে পারবেন।
- শিক্ষক শিক্ষণের সুযোগ সুবিধা বর্ধন করতে পারবেন।
- শিক্ষণ শিক্ষণে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করতে পারবেন।
- শিক্ষক শিক্ষণ ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। শিক্ষকদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিক্ষকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু সুপারিশ করেন।

ক. শিক্ষক শিক্ষণের গুরুত্ব

জাতীয় জীবনে উপযুক্ত শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ শিক্ষকের সুষ্ঠু পেশাগত শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষকতা যে একটি পেশা এবং অন্যান্য পেশার ন্যায় এর জন্যও যে উপযুক্ত প্রস্তুতি প্রয়োজন এ সত্যটি এখনও আমাদের দেশে পুরোপুরি স্বীকৃতি লাভ করেনি। বস্তুতঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে গৃহ, উপকরণ ও অন্যান্য ব্যাপারে নিয়োজিত সম্পদ সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় যদি শিক্ষকদের মান উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়। আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নো জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়। আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নকল্পে সুসংঘবদ্ধ অভিযান চালাতে হবে। এ কথা স্মরণীয় যে মানুষ গড়ার কারিগররূপে শিক্ষকের যে দায়িত্ব তা সুসম্পন্ন করতে শিক্ষককে যে শুধু প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে তা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠদানে তাঁর বিশেষ দক্ষতাও থাকতে হবে । সর্বোপরি কোমলমতি বালক বালিকাদের সুষ্ঠু শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত গুণাবলীর অধিকারী হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে কাজের নিরাপত্তা ও মানসিক তৃপ্তির ব্যবস্থা না থাকিলে শিক্ষকতায় যোগ্য শিক্ষণের যে সকল আধুনিক রীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলিকে প্রয়োজনমত প্রয়োগ করে আমাদের দেশের উপযোগী শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

খ. প্রাইমারী ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষণ

১৯৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক তৈরির জন্য দু'প্রকারের শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল। যথা– প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল ও প্রাইমারী ট্রেনিং সেন্টার। এদের পূর্বে বলা হত গুরু ট্রেনিং স্কুল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল নিম্নমানের। ভর্তির যোগ্যতা ছিল মধ্য বাংলা পাস। প্রাইমারী শিক্ষক শিক্ষণের মান উন্নয়নে জন্য ১৯৫১ সালে পরীক্ষা মূলকভাবে চারটি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত হয় প্রবেশিকা পাস। ক্রমে ক্রমে এ স্তরের নিম্নমানের শিক্ষক শিক্ষণ স্কুলগুলোর অবলুপ্তি ঘটে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫২টি সরকারী প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট রয়েছে। এ ছাড়া, ময়মনসিংহ মহিলা শিক্ষক শিক্ষণ কলেজেও বি,এড, কোর্সের সঙ্গে সঙ্গে পি.টি.আই কোর্স পড়ানো হয়।

১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর (৬ষ্ট হইতে ৮ম শ্রেণী) শিক্ষকদের শিক্ষণ নর্মাল স্কুলে দেয়া হত এবং শিক্ষণকালের মেয়াদি ছিল দুই বছর। ১৯৫২ সালের পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণগঠন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৬ সালে নর্মাল স্কুলগুলোকে জুনিয়র ট্রেনিং কলেজে রূপান্তরিত করা হয় তবে কোর্সের মেয়াদ অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত জুনিয়র ট্রেনিং কলেজগুলো টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ন্যায়ই শিক্ষাক্রম, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি ব্যাপারে স্বাধীনতা ছিল এবং এদের প্রদত্ত সার্টিফিকেটকে বলা হত উচ্চতর শিক্ষা সার্টিফিকেট। পরে জুনিয়র ট্রেনিং কলেজগুলোর শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন সম্পূর্ণভাবে বহিঃ পরীক্ষার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর পেশাগত স্বাধীনতা বহুলাংশে লোপ পায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা বোর্ডের আওতায় আনার পূর্বে জুনিয়র ট্রেনিং কোর্স ছিল প্রান্তিক। অপর দিকে সেকেন্ডারী স্কুলের নিম্ন ক্লাসের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আকর্ষণীয় ছিল না। ফলে কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পায়। শিক্ষা বোর্ডের আওতায় আসার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে লোপ পেলেও কোর্সটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে, কেননা সফলকাম শিক্ষার্থীরা প্রথম ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হবার সুযোগ পায়।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। মাধ্যমিক স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর জন্য শিক্ষক তৈরী করাই ছিল এ কলেজগুলোর মূল উদ্দেশ্য। অথচ দেখা গেল শিক্ষা বোর্ডের আওতায় আসার পর হতে কোর্সটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুল শিক্ষকতা করবার প্রবণতার পরিবর্তে উচ্চ শিক্ষা লাভের দিকেই প্রবল ঝোঁক দেখা দেয়।

কলেজগুলোর নানাবিধ সুযোগ সুবিধা, যেমন– ফি টিউশন, বৃত্তি ও ছাত্রাবাস, শুধু উপরোক্ত ঝোঁক চরিতার্থ করার ইন্ধন যোগায়। ১৯৭২ সাল হতে জুনিয়র ট্রেনিং কলেজগুলোকে কলেজ অব এডুকেশনে রূপান্তরিত করে তিন বছর মেয়াদী ব্যাচেলর ইন এডুকেশন কোর্স চালু করা হয়েছে। এ কলেজগুলোতে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হ'ল দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাস। এ ছাড়া টিচার্স কলেজে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক তৈরি করা হয়। এ কলেজগুলোর কোর্সের মেয়াদ হল দশ মাস এবং ভর্তির ন্যূণতম যোগ্যতা হল গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী।

গ. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন

মাধ্যমিক স্কুলের নবম হতে-একাদশ পর্যন্ত যে সকল বৃত্তি প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে তন্মধ্যে শিক্ষক শিক্ষণ অন্যতম। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছেন এরূপ কিছু সংখ্যক নির্বাচিত স্কুলে শিক্ষক শিক্ষণ কোর্স চালু করতে হবে। এ কোর্স সফলতার সঙ্গে পাস করার পর একজন শিক্ষার্থী স্কুলের ১ম হতে ৫ম শ্রেণীতে শিক্ষকতা করতে সক্ষম হবেন। এর ফলে আমাদের নারী সমাজ শিক্ষকতাকে পেশারুপে গ্রহণ করতে প্রয়োজনীয় সুযোগ পাবেন। পৃথিবীর উন্নত দেশ সমূহে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতায় মহিলারাই সংখ্যায় অত্যাধিক। অথচ আমাদের দেশে এ সংখ্যা মাত্র তিন শতাংশ। বলাবাহুল্য মহিলারা স্বভাবতই স্নেহ প্রবণ বিধায়– এ স্তরে শিশুদের শিক্ষাদানে জন্য পুরুষদের চেয়ে তাঁরাই অধিকতর উপযুক্ত। তদুপরি দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষিকার প্রয়োজন, উপরোক্ত কোর্স এ চাহিদা মেটাইতেও সহায়ক হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৫৭ সালের শিক্ষা কমিশনও অনুরূপ শিক্ষক শিক্ষণ কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ করে ছিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য যে সোভিয়েট ইউনিয়নেও সপ্তত বা অষ্টম শ্রেণীর শেষে প্রাইমারী স্তরের ভাবী শিক্ষিকাদের জন্য তিন হতে চার বছর স্থায়ী শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে চালু রয়েছে। প্রাইমারী স্তরে শিক্ষিকার সংখ্যা বাড়াবার জন্য ইউনেস্কোর নিম্নলিখিত সুপারিশগুলোও গ্রহণ করা উচিত–

ক. শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ন্যূণতম ভর্তির যোগ্যতা ও বয়স হ্রাস করা।
খ. মহিলা স্কুলে শুধু শিক্ষিকা নিয়োগ করা।
গ. শিক্ষিকাদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা।
ঘ. শিক্ষণকালে মহিলাদের বেতন/বৃত্তি দেওয়া।

ঙ. শিক্ষিকাদের জন্য বাস গৃহের ব্যবস্থা করা।

চ. অনুন্নত অঞ্চল ও পল্লী গ্রামের শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ বেতনের ব্যবস্থা করা।

ছ. শারীরিক সুস্থ ও অবসর প্রাপ্ত মহিলাদের শিক্ষিকারূপে নিয়োগ করা।

জ. যদি স্বামী-স্ত্রী চাকুরী হন, তবে তাঁদের একই স্থানে নিয়োগ করা।

ঘ. শিক্ষক শিক্ষণের সুযোগ সুবিধা বর্ধন

বিপুল সংখ্যক শিক্ষকদের নিয়মিত পেশাগত শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়ার জন্য যথাশ্রীঘ্র সম্ভব নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত–

ক. প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট গুলোর সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা, শ্রেণী কক্ষ, হোষ্টেল, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরী, শিক্ষকদের বাসগৃহ এরূপভাবে বর্ধিত করা যাতে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সম্ভবপর এবং শিক্ষা ভবনের ব্যাপারে ব্যয় সংকোচনের খাতিরে আধা স্থায়ী গৃহ তৈরি না করে টিনের চালযুক্ত স্থায়ী একাধিক তল বিশিষ্ট ভবিষ্যত সম্প্রাসারণের উপযোগী পাকা গৃহ নির্মান করা।

খ. শুধু মহিলাদের জন্য কতিপয় প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা এবং অন্যান্য পি.টি.আই গুলোতে তাঁদের জন্য হোষ্টেল নির্মাণ করা।

গ. যেহেতু ঢাকা শহরে কোন পি.টি.আই. নাই, সেহেতু তথায় একটি পি.টি. আই স্থাপন করা।

ঘ. টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সুযোগ সুবিধা বর্ধিত করা এবং অনতিবিলম্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শিক্ষা বিভাগ চালু করা ও কালক্রমে একে একটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটে পরিণত করা।

ঙ. প্রতিনিয়ত গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষণ তত্ত্বকে আধুনিক ও দেশোপযোগী করা, বর্তমানে শিক্ষক শিক্ষণে মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় পুস্তক ও পত্র পত্রিকার একান্তই অভাব বিধায় শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ছুটি মঞ্জুর করে পাঠ্য বই শেখার সুযোগ দেওয়া।

চ. কর্মরত মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বর্তমান বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রের আরও উন্নয়ন এবং কার্যক্রমের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। রাজশাহী বিভাগে একটি নতুন শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। চট্রগ্রাম ও খুলনা বিভাগে বর্তমান কেন্দ্রের দুটি উপকেন্দ্র স্থাপন করা আবশ্যক। শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোকেও এ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ কারীদের সেমিষ্টারের ভিত্তিতে ডিগ্রী. অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট, অগ্রিম ভাতা, যাতায়াত খরচ ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে কর্মরত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জনপ্রিয় করা উচিত।

ছ. পেশাগত শিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এ শিক্ষণ খন্ডকালীন ও চিঠি পত্রের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা যায়। এসবের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পি.টি.আই. টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কলেজ অব এডুকেশন, শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং শিক্ষা গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে দায়িত্ব দেয়া প্রয়োজন।

জ. বর্তমানে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অবাঞ্চিত অনুপাতের হার বিদ্যমান। এই অনুপাত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ছাড়া ১ ঃ ১৫ হওয়া উচিত।

ঝ. শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নীত করা এবং ডিগ্রী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রফেসরের পদসহ অধিক সংখ্যক সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের পদ সৃষ্টি করা দরকার।

ঞ. শুধু মাত্র উচ্চতর শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো ন্যূনতম তিন বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে এম.এড. কোর্সে এবং পাচঁ বছরের শিক্ষকতরা অভিজ্ঞতা থাকলে ডক্টরেট কোর্সে ভর্তি করা যেতে পারে।

ট. দেশের চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের বর্তমান কার্যক্রম সমূহের পূর্ণবিন্যাস করা প্রয়োজন।

ঠ. মাধ্যমিক স্তর থেকেই মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ঘ. প্রাইমারী স্তরে শিক্ষক শিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ–

ক. প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটগুলোকে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করা এবং এদের শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন করা।

খ. ইনষ্টিটিউটগুলোর শ্রেণী কক্ষ, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগারে প্রভৃতির উন্নয়ন সাধন করা।

গ. শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে থাকার ব্যবস্থা করা ও মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য হোষ্টেল নির্মাণ করা।

ঘ. শিক্ষার্থীদের জন্য ঋণের ব্যবস্থাসহ অধিক সংখ্যক বৃত্তির বন্দোবস্ত করা।

ঙ. বর্তমানে এক বছর মেয়াদী পি.টি.আই. কোর্সের দুই বছরে উন্নীত করা।

চ. উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য তিন বছর প্রাইমারী স্কুলে চাকুরীর পর বি.এড. কোর্সে ভর্তির সুযোগে দেওয়া।

ঙ. শিক্ষক শিক্ষণে নতুন দিগন্ত

এ উপমহাদেশে প্রায় এ শতাব্দী পূর্বে মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকদের জন্য গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী লাভের পর পর্যায় ক্রমিক দশ মাস স্থায়ী শিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছিল। এ ধরনের শিক্ষণ কোর্সের ত্রুটির জন্য পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে এমন কী ইংল্যান্ডে বহুকাল ধরে তিন বছর স্থায়ী যুগবৎ বিষয় কেন্দ্রিক ও পেশা ভিত্তিক সমন্বিত শিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। এ কোর্সের প্রধান লক্ষ্য হল ভারী শিক্ষককে পেশাগত জ্ঞানদানের সংগে সংগে দুটি বিশেষ স্কুল বিষয়ে শিক্ষণ পদ্ধতি সহ পারদর্শী করে তোলা। এছাড়া অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষণ লাভের ফলে শুধু যে শিক্ষকতার জন্য তাঁর পক্ষে বাঞ্ছিত দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব তা নয়, বরং পেশার প্রতি তাঁর অনুরাগ ও বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৭ সালে শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য এগার বছর মেয়াদী স্কুল শিক্ষার পর শিক্ষক শিক্ষণে তিন বছর স্থায়ী যুগপৎ ডিগ্রী কোর্স চালু করার সুপারিশ করেছিলেন। সে সুপারিশের সংগে বাংলাদশে শিক্ষা কমিশন একমত। টিচার্স ট্রেনিং কলেজের দশ মাস স্থায়ী বর্তমান কোর্সটি অত্যন্ত অপর্যাপ্ত বিধায় এর স্থলে ক্রমে ক্রমে তিন বছর স্থায়ী শিক্ষক শিক্ষণ কোর্স চালু করা প্রয়োজন।

চ. শিক্ষক শিক্ষণ ও বিশ্ববিদ্যালয়

সকল উন্নত দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে শিক্ষক শিক্ষণের নিবিড় যোগসূত্র বিদ্যমান অথচ আমাদের দেশে এ সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। কেননা আমারা শিক্ষক শিক্ষণকে শুধু ভাবী শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়রূপে ভাবতে অভ্যস্ত, সমাজ বিজ্ঞান রূপে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেনি। যেহেতু শিক্ষক শিক্ষণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটি বড় হাতিয়ার সেজন্য আমাদের দেশেও স্বতন্ত্র বিভাগ খুলে বিষয়টিকে ডিগ্রী কোর্স রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের আনডার গ্র্যাজুয়েট ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে প্রবর্তন করা উচিৎ। প্রথমোক্ত কোর্সটির উদ্দেশ্য হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের সহায়তায় তিন বছর মেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে স্কুলের ভাবী শিক্ষকদের দুটি বিশেষ বিষয় ও পেশাগত

বিষয় যুগপৎ অধ্যয়নের ব্যবস্থার করে শিক্ষক শিক্ষণে প্রথম ডিগ্রী লাভের সুযোগ দেয়া। পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সটির লক্ষ্য হবে–

ক. উপদেশ ও নির্দেশনায় এবং শিশু মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য শিক্ষণে প্রথম ডিগ্রীধারী অভিজ্ঞ শিক্ষকদের জন্য উপরোক্ত ক্ষেত্রে বিশেষ ডিপ্লোমা কোর্সের প্রবর্তন করা।

খ. শিক্ষণে প্রথম ডিগ্রীধারী অভিজ্ঞ ও মেধাবী শিক্ষক ও শিক্ষণ প্রশাসকের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী এম.এড. ও ডক্টরেট কোর্স প্রবর্তন করা।

গ. আন্তঃ বিভাগীয় ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষণে গবেষণাকে উৎসাহিত করা।

ঘ. বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকের জন্য রিফ্রেসার কোর্স ও গ্রীস্মকালীন ইনষ্টিটিউটের মাধ্যমে বিষয় কেন্দ্রিক ও পদ্ধতিগত জ্ঞানের নবায়নে সাহায্য করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুলে ভর্তির যোগ্যতা কী ছিল?
- (ক) ম্যাটিক পাস
- (খ) ইন্টারমিডিয়েট পাস
- (গ) নন-ম্যাট্রিক
- (ঘ) মধ্য বাংলা পাস

২। চারটি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট সর্ব প্রথম কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
- (ক) ১৯৫০ সালে
- (খ) ১৯৫১ সালে
- (গ) ১৯৫২ সালে
- (ঘ) ১৯৫৩ সালে

৩। কলেজ অব এডুকেশন এর বি. এ. ইন এডুকেশন কোর্সের মেয়াদ কত বছর ছিল?
- (ক) এক বছর
- (খ) দুই বছর
- (গ) তিন বছর
- (ঘ) চার বছর

৪। কী কারণে মহিলারা শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য পুরুষদের চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত বলে বিবেচিত?
- (ক) মহিলারা শিশুদের গল্পোচ্ছলে শিক্ষাদানে পারদর্শী
- (খ) মহিলারা শিশুদের খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদানে পারদর্শী
- (গ) মহিলারা শিশুদের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদানে পারদর্শী
- (ঘ) মহিলারা শিশুদের প্রতি স্নেহপ্রবণ ও সহানুভূতিশীল

৫। ইংল্যান্ডে যে শিক্ষক শিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে তার মেয়াদ কত বছর?
- (ক) দুই বছর
- (খ) তিন বছর
- (গ) চার বছর
- (ঘ) পাঁচ বছর

৬। বাংলাদেশে শিক্ষা কমিশন বি.এড. কোর্সের মেয়াদ কত বছর করার জন্য সুপারিশ করেন?
- (ক) দুই বছর
- (খ) তিন বছর
- (গ) চার বছর
- (ঘ) পাঁচ বছর

৭। শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ব্যতীত শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত কত হওয়া উচিত?
- (ক) ১ ঃ ১
- (খ) ১ ঃ ২০
- (গ) ১ ঃ ২৫
- (ঘ) ১ ঃ ৩০

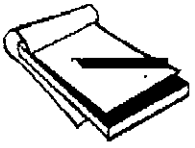

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৪

এই ইউনিট পাঠ করে আপনি বিষয়বস্তু কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত ও রচনা মূলক প্রশ্ন

১। কুদরত-ই-খুদা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষণ কোর্স কিরূপ হবে?
২। কর্মরত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন?
৩। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য এ কমিশনের সুপারিশ কী ছিল?
৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ খোলার যুক্তি প্রদর্শণ করুন।
৫। শিক্ষক শিক্ষণের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে কুদরত-ই-খুদা কমিশনের অভিমত কী?
৬। কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টের পটভূমি সম্পর্কে কী জানেন?
৭। এ কমিশনের রিপোর্টে বর্ণিত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?
৮। কী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়?
৯। কীভাবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়?
১০। প্রাথমিক শিক্ষার মূল্য উদ্দেশ্য কী কী?
১১। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
১২। মাধ্যমিক শিক্ষাকে অধিকাংশের জন্য প্রান্তিক শিক্ষায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে এ কমিশনের সুপারিশসমূহ বর্ণনা করুন।
১৩। সংক্ষেপে শিক্ষক শিক্ষণের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
১৪। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক শিক্ষণ কোর্স প্রবর্তনের স্বপক্ষে কুদরত-ই-খুদা কমিশনের অভিমত ব্যক্ত করুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ৪

পাঠ ৪.১

১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ ৬। গ

পাঠ ৪.২

১। গ ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। খ ৬। খ

পাঠ ৪.৩

১। গ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ঘ ৬। ঘ

পাঠ ৪.৪

১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ ৬। খ ৭। ক